সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

২৪/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

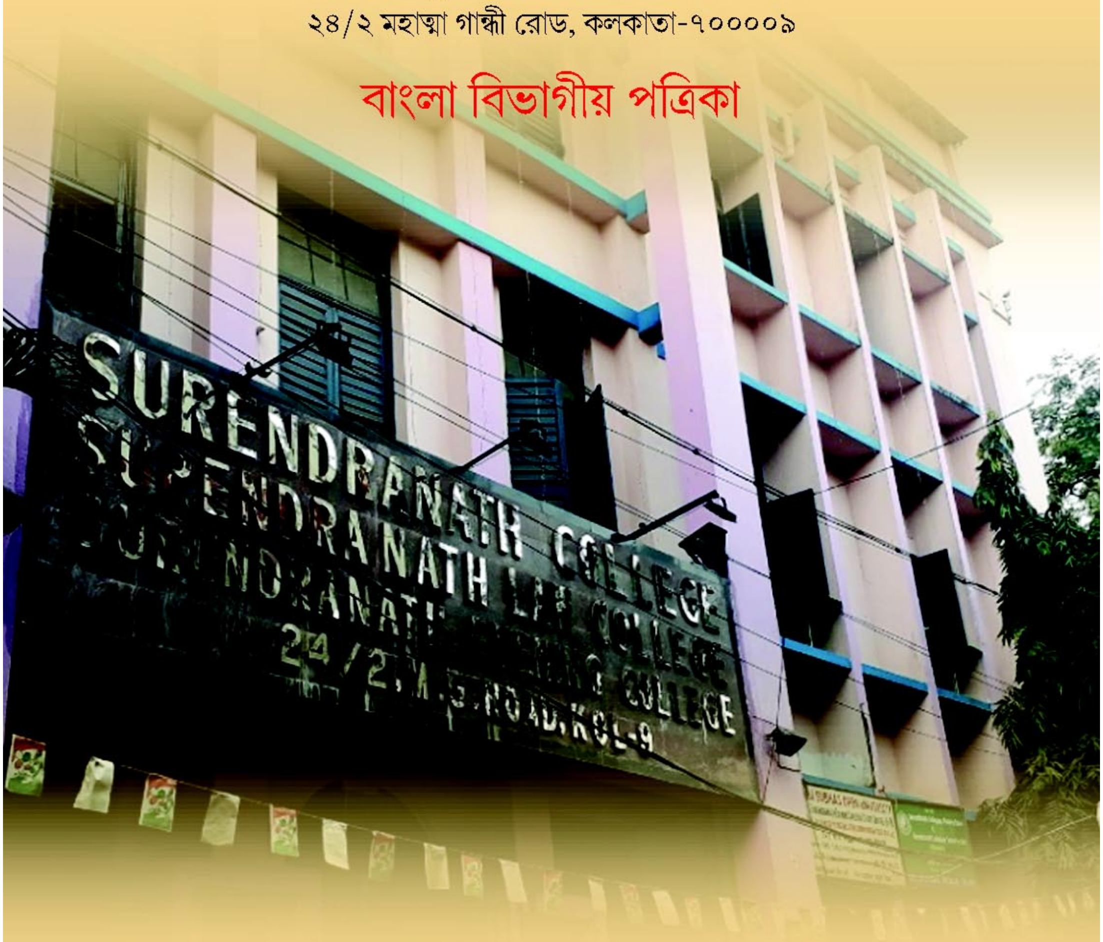

ই-ম্যাগাজিন

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

২৪/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ই-ম্যাগাজিন

ই-ম্যাগাজিন
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

প্রকাশ
মার্চ ২০২১

সম্পাদক
ড. অভিজিৎকুমার ঘোষ

প্রকাশক
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
বাংলা বিভাগ
কলকাতা

সম্পাদকীয়

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলা বিভাগের ই-ম্যাগাজিন প্রকাশিত হল। করোনা পরিস্থিতি, পরীক্ষার চাপ ও ক্লাসের ব্যস্ততার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা যে লেখা দিয়েছে, তাতেই এই পত্রিকা সমৃদ্ধ। বারবার তাগাদা দিয়ে তাদের কাছ থেকে যে কবিতা (যার সংখ্যাই বেশি) ও গদ্যধর্মী প্রবন্ধ গল্প ইত্যাদি পাওয়া গেছে, সেগুলি যথাসম্ভব পরিমার্জন করে এই পত্রিকায় রূপায়িত হয়েছে। তবে এটুকু বলতে পারি, আকারে তুলনামূলক ছোটো হলেও পত্রিকার লেখাগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ের স্বাদ পাওয়া যাবে। তাছাড়া কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করা ছেলেমেয়েদের লেখাগুলিতে নানাবিধ চিন্তা-চেতনার ছাপও বর্তমান। অনেক লেখাতেই তাদের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পরিস্ফুট। এই ই-ম্যাগাজিন প্রকাশে আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. ইন্দ্রনীল কর মহাশয় যথার্থ অভিভাবকের মতো উৎসাহ ও পরামর্শ দান করেছেন। কাজটা যে সহজেই করা যায় এই বিশ্বাস সঞ্চার করেছেন তিনি। কলেজ অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ধারক আয়োগের (আই. কিউ. এ. সি) আহ্বায়ক ড. সুচন্দ্রা চ্যাটার্জির সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। আমাদের বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপিকা সুমিতা সাহার আগ্রহ এবং সজাগ দৃষ্টি পত্রিকা প্রকাশের কাজকে করেছে ত্বরান্বিত। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বাধা বিপত্তিগুলো অতিক্রম করা গেছে সহজেই। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস বিভাগের অন্যান্য কাজের মতো এ ব্যাপারেও অত্যন্ত সক্রিয়। ছাত্রছাত্রীদের লেখা দেওয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে একেবারে চূড়ান্ত রূপ নির্মাণ পর্যন্ত তাঁর সচেতন দৃষ্টি মনে রাখার মতো। বিভাগের প্রবীণতম অধ্যাপিকা ড. শুভ্রা বৈশ্য লেখাগুলিকে পরিমার্জন করে না দিলে এ পত্রিকা বার করা কঠিন হয়ে পড়ত। তাঁর দেওয়া উপদেশগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না দত্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। কলেজের অন্যান্য সহকর্মীদের কাছ থেকেও পেয়েছি সুপরামর্শ। আসলে সম্মিলিত চেষ্টার ফসল এই ই-ম্যাগাজিন। এর পরেও যদি কিছু ভুল-ত্রুটি থাকে তার দায় কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। তবে যাদের লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল তারা যেমন আনন্দ পাবে তেমনি যারা নানা কারণে লিখতে পারেনি তারা যে আগামীদিনে লিখতে উৎসাহী হবে একথা বলা যেতেই পারে। এই পাওনাটুকুও বোধ হয় কম নয়।

সূ চি প ত্র

শিক্ষা সুমহান

সঞ্জয় মণ্ডল

৭

লকডাউন

আলাপন বোস

৮

জীবনতরী

শুভম্ অধিকারী

১০

হকার

অদিতি সিংহ

১১

অপেক্ষা

অরিন্দম মণ্ডল

১৩

ভাই বোন

শান্তনু বৈদ্য

১৫

ওরা কারা?

আসমীর মণ্ডল

১৬

বাতিঘর
আসিরুল সেখ
১৮

প্রবন্ধ

নববর্ষে ওদের কথা
সিম্পা সরকার
১৯

জীবন ভাবনা
অলিম্পিয়া চৌধুরী
২০

চিঠি থেকে ফেসবুক
রিয়া কর্মকার
২১

যুগ
ইন্দ্রানী রায়
২২

নৃশংস
ঐশী বিশ্বাস
২৩

শিক্ষা সুমহান

সঞ্জয় মণ্ডল
বি.এ (জেনারেল), প্রথম সেমেস্টার

শিক্ষা মোদের বড় করে,
মন্দ থেকে ভালো।
শিক্ষা জ্বালে জ্ঞানের প্রদীপ,
অন্ধকারে আলো।
শিক্ষা মোদের চলার ছন্দ,
জীবনের গতি।
মহৎ কর্মে শিক্ষা মোদের,
আনে শুদ্ধমতি।
শিক্ষা মোদের চলার সাথী,
জ্ঞানের নাইকো শেষ।
সুশিক্ষিত সভ্য মানুষ,
গড়ে মহান দেশ।
শিক্ষাই দেয় প্রেরণা,
ন্যায়ের অস্ত্র ধরতে।
শিক্ষাই পারে পরাধীনতার,
শৃঙ্খল মুক্ত করতে।
শিক্ষা যোগায় মানবপ্রীতি,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলল গীতি।
আমরা আজ গাইব শুধু,
শিক্ষারই জয়গান।
শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড,
শিক্ষা মানবকল্যাণ।

লকডাউন

আলাপন বোস
বাংলা (অনার্স), পঞ্চম সেমেস্টার

শুনলাম ভাইরাস চীনকে
আক্রমণ করেছে,
ভেবেছি আমাদের কী?
তখনও জানিনা - ঐ নিঠুর ভাইরাস
আক্রমণ করবে
আমাদেরও।
গত মার্চ থেকে লকডাউন,
ভারতবর্ষ দিশেহারা।
আমরা সবাই গৃহবন্দী
সতর্ক পুলিশ - অকারণে যেন
পথে ঘোরে না কেউ।
সদা জাগ্রত ডাক্তার
বাঁচাতে হবে রোগীকে।
সমাজ বন্ধু সেদিন এঁরাই।
কাজ হারানো মানুষ খোঁজে কাজ।
মৃত্যু-পথযাত্রী করোনা রোগী
খোঁজে শ্বাসবায়ু।
বিপদ আরো বাড়িয়ে আসে
আমফান ঝড়।
কত মানুষ হয় গৃহহারা।
পরিযায়ী শ্রমিকের নিঃস্ব বাড়ি ফেরা,
বাড়ে দুর্ভোগ দিনে দিনে।

তাদের পায়ে হাঁটা - বাড়ি ফেরা
সমাজের চোখে ঝরে জল।
ট্রেন লাইনে কতজনের
মৃত্যুর সংবাদ
করে ব্যথিত, বিকল।
কত মৃত্যু আত্মহত্যা
পেরিয়ে এসে,
জীবনের নৌকায় হয়েছে ঠাঁই।
জোটবদ্ধ হয়ে বাঁচতেই
হবে ভাই।

জীবনতরী

শুভম অধিকারী
বাংলা (অনার্স), প্রথম সেমেস্টার

তোমার তরে আমি বড়ই ধনী যে,
এই কথাটি বলতে নাহি বাজে।
তোমার তরে জীবন আমার
ধন্য হল যে,
এই কথাটি বলতে নাহি বাজে।
তোমার কাছে আসিয়াছিলাম
যবে,
সন্তান স্নেহে কাছে নিয়াছিলেন
তুলে।
জীবনে মরণে সেই স্মৃতিটি
রাখিব সযতনে।
তারপরে যদি পূজার বেলার
শেষে,
স্মৃতিগুলি সব ধূলায় গিয়া
মেশে।
তবে ক্ষতি নাহি কিছু হবে,
স্মৃতিগুলি সব থাকিবে
মানসপটে।
স্মৃতির পটে নানান আলো,
নানান ছায়ার খেলা।
তীরে যখন বাজিবে বাঁশী
তখন যাওয়ার পালা।
আবার তুমি রাখিবে আমায়
তোমার মত করে,
দূত পাঠিও তখন তুমি
থাকবো তোমার হয়ে।

হকার

অদিতি সিংহ
বাংলা (অনার্স), তৃতীয় সেমেস্টার

জীবন কাটে ট্রেনে বাসে হকারি করে,
মাথার ঘাম পায়ে পড়ে অজস্র
ক্লান্তির ভারে।
প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা
মানুষগুলি জানে,
পরিশ্রম কাকে বলে?
তারা দিনে রাতে কাজ খোঁজে,
দিন আনে দিন খায়...,
ভোর হতেই বেড়িয়ে পড়া...
আঁধার রাতে বাড়ি ফেরা।
কঠোর-হাড়ভাঙা খাটুনি
তারা জানে, পয়সার মূল্য কী?
আসে দুর্দিন — অন্ন নেই ঘরে।
ক্ষুধার জ্বালায় বুঝি ভিক্ষাও করে।
বিশ সালে বিশ্ব হল বিষ,
অসহায় মানুষ দিল বলিদান।
কঠোর পরিশ্রমী এক হকার
ঝুলে পড়লো একদিন —
দেহ হ'ল নিথর।
সে কবিদের কবিতায় উঠে আসে না,
সে সাধারণ মানুষ।
টিভি-র পর্দায় তাকে নিয়ে
শোরগোল হ'ল না।

১২

এক তারকার নিথর দেহ
যখন ঝুলে থাকে,
সবাই তার জন্য হাজার
দুঃখ প্রকাশ করে।
খবরের কাগজের প্রথম পাতায় —
টিভি-র পর্দায় —
প্রতিনিয়ত তাকে তুলে ধরা।
সেই তারকার মৃত্যুর পরেও...
তাকে নিয়ে ঝড় তোলা হয়,
সোশ্যাল মিডিয়ায়।
আজ যে মানুষটার
নিথর দেহটা
ঝুলছে।
হাজার নামকরা তারকাদের
ভিড়ের মাঝে
সে চাপা পড়ে বিলীন
হয়ে যাবে।
তার পরিবার থাকবে
অপেক্ষায়-আশায়...।
সেই সাধারণ মানুষ,
সেই হকারের অপেক্ষায়
তারা দিন গুনবে।

অপেক্ষা

অরিন্দম মণ্ডল
বাংলা (অনার্স), তৃতীয় সেমেস্টার

এত অজস্রবার ধ্বংস হয়েছিল,
তবুও ধ্বংস অভ্যাস হল না।
প্রতিটা যুদ্ধের পরে গড়ি নূতন বসত,
পরবর্তী যুদ্ধের অপেক্ষায়।
বারবার ফিরে যাই
নিজেরই বদ্ধ দরজায়।
অদ্ভুত মত্ততায়
কত কবিতাই তো তাকে
ভেবে লেখা।
অথবা
দিনবদলের কাব্য
যাই হোক না কেন।
পথ চলতে চলতে
যদি বা দেখা হয়
প্রশ্ন করিস না যেন —
নিভৃত ঘরের কোণে
উত্তাল সমুদ্র কেন?
চারিদিকে শুধু জল আর জল,
কতকাল আলোর স্পর্শ পায়নি
এই অতল।
আয়নায় নিজের গলিত
মুখের অবয়ব।
আর গাঁদা ফুল ফোটো ফ্রেমে,

১৪

কল্পনায় ভেসে আসে
চেনা ধূপের গন্ধ।
তবুও আর একবার
রাজি আমি
ঝুঁকি নিতে তার
চোখের সম্মোহনে।
ভেবে দেখ, এতবার ভেসে গেছি —
তলিয়ে গেছি,
তবুও ভুলিনি —
সব যুদ্ধের পরেও
মানুষ কিভাবে জেতে!

ভাই বোন

শান্তনু বৈদ্য
বাংলা (অনার্স), প্রথম সেমেস্টার

আমার যদি থাকতো
ছোটো একটা বোন,
রাখীতে হাত ভরিয়ে দিতো,
খুশীতে ভরতো মন।
উপহারের ডালি তারে
তুলে দিতাম হাতে।
কত স্বাদের মণ্ডা মিঠাই
সে দিতো আমার পাতে।
স্নেহের আদর করতাম তাকে
দিয়ে মাথায় হাত।
বলতাম তাকে, করলাম আমি
তোকে আশীর্বাদ।
খুশীতে সে উঠতো নেচে,
বলতো, 'আমার মিষ্টি দাদা,
সারা জীবন হাসব আমি,
ভুলেই যাব কাঁদা।'

ওরা কারা?

আসমীর মণ্ডল
প্রাণীবিদ্যা (অনার্স), প্রথম সেমেস্টার

ওরা কারা? যারা ইদের নামাজে
এভাবে গুলি চালায়।
প্রাণ বাঁচাতে মানুষ তখন
যেদিকে পারে পালায়।
বহু মানুষ হারিয়ে ফেলে
'আল্লাহ্' বলার ক্ষমতা।
ওরা কারা? যাদের নেই
এতটুকু মমতা।
ওরা কারা? যারা নিজেদের
মুসলিম বলে বেড়ায়।
সাত খুনের পর সাত হাত দাড়িতে
সাতশো নেকি কামায়।
ওরা কারা? যারা কখনও
কাউকে পায় না ভয়।
যারা ভাবে, নামাজ রোজাতে
সাতখুন মাপ হয়।
ওরা কারা? যাদের মানবিকতার
ছিটেফোঁটা টুকু নাই।
সারাটা জীবন কেবল শুধু
মৃত্যুর গান গায়।
ওরা কারা? যারা সন্ত্রাসের বর্ম
পড়েছে নিজের গায়ে।

প্রাণভিক্ষায় মানুষ মাথা
ঠুকছে যাদের পায়ে।
ওরা কারা, ওরা সৎ, ধার্মিক
মুসলিম হবে যদি,
ঈদের নামাজে, মসজিদে কেন
বওয়ালো রক্তনদী।
ওরা কারা? যারা মানবসমাজকে
ভাবে নিজের শিকার,
রক্তখাকী সেই রঙিনদের
জানাই শত ধিক্কার।

বাতিঘর

আসিরুল সেখ

শব্দ ঝড়ের অগ্নিবলয় তুমি
লেখাগুলো রোজ উঠে আসে স্মৃতিপাকে,
শীতের দুপুরে পাতাঝরা গাছে বসে
প্রতিটি কবিতা আমি শুনিয়েছি তাকে।

যতবার গেছি যুক্তির কাছাকাছি
আলোকে সরিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছ রাতে,
চেতনার পাশে মরসুমি কলমেরা
কথামানবীর স্মৃতি লেখে ধারাপাতে।

তুমি কি দেখেছ বহু বিস্ময়ের আলো?
রহস্যময় বোধের বাতিঘরে,
শুনশান কোনো বর্ষা মেঘের রাতে
তোমার স্মৃতি কী এখনো কবিতা পড়ে?

বৈশাখী রোদে কতো আলো থাকে বলো?
তবুও হেঁটেছি গ্রীষ্মকালের দিকে,
স্থায়ী অক্ষরে চোখ পড়তেই দেখি
অতীতের স্মৃতি মৃত্যুর মতো ফিকে।

চলে গিয়ে তুমি ভালোই করেছ জানি
বন্দী পাখিকে মুক্তির স্বাদ দিলে,
ছায়াঘেরা নীল বাতিঘর শুধু জানে
সেদিন ও-তুমি আমার কবিতা ছিলে।

প্রবন্ধ

নববর্ষে ওদের কথা

সিম্পা সরকার
বাংলা (অনার্স), পঞ্চম সেমেস্টার

বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ চারিদিক আলোয় আলোকিত। গোটা বিশ্ব নূতনকে আহ্বান জানাতে প্রস্তুত, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০। নববর্ষের সেলিব্রেশনে ব্যস্ত সমাজ।

কিন্তু যারা আশ্রয়হীন, তাদের কাছে পুরাতনকে বিদায় দিয়ে এই নূতনকে বরণ করে নেওয়া এসব কথা অর্থহীন। যাদের সারাদিন পেটের ভাত যোগাতে ব্যস্ত থাকতে হয়, ছাদ নেই যাদের মাথার ওপর, শহরের ডাস্টবিন কুড়িয়ে যারা ‘অমৃত’ জ্ঞানে খায় ফেলে দেওয়া খাবার। এমনকি ঐ পচা খাবার তুলে নেবার জন্য শাল পাতাও জোটে না যাদের, ছেঁড়া পোস্টার, ময়লা ঠোঙা অথবা শুধু হাত দুটিই যাদের খাবারের পাত্র। তাদের কাছে নূতন বছর নূতন হয়ে উঠতে পারে না। এই দিনটি তাদের কাছে নিত্যদিনের মতোই অভিশপ্ত।

অথচ পথ-ভিক্ষুক শিশুদের মায়াঘন দুই চোখেও তো থাকে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। তাদেরও তো ইচ্ছা করে নববর্ষের উৎসবে সামিল হতে। তাই মনে হয়, এই সমস্যার সমাধানে সহৃদয় মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী কোনো সংস্থা, এককথায় গোটা সমাজও দেশকেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সহায়তা ছাড়া ক্ষুধার্ত, নিরাশ্রয় এই মানুষগুলির কাছে নববর্ষের তাৎপর্যকে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। তাই প্রয়োজন সমাজের শুভবুদ্ধির জাগরণ, তাহলেই সকলের মিলনে নববর্ষ উদ্‌যাপন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

জীবন ভাবনা

অলিম্পিয়া চৌধুরী
প্রথম সেমেস্টার

জীবন মূল্যবান, তবু জীবনের গুরুত্ব ভুলে গিয়ে মানুষ কখনো কখনো জীবন থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি চায়। কেন? এর জন্য দায়ী আমাদের ভাবনাচিন্তার পরিবর্তন। আমাদের জীবন ভাবনা ইতিবাচক হলে তা অসাধ্য সাধন করে। আবার নেতিবাচক জীবনভাবনা মানুষকে ভুলপথে চালিত করে।

আমরা বর্তমানে হয়তো নিজের সঙ্গে অন্যকে নিয়েও বেশি ভেবে ফেলি, অন্যের উপর প্রচণ্ড ভাবে নির্ভরশীল হই। সেখানে যখন না পাওয়া আসে, তখনই জীবন সম্পর্কে হতাশ হই। জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাই।

আসল সমস্যা তাই আমাদের জীবন ভাবনায়, আমাদের চিন্তাধারায়। এই জীবনবোধের পরিবর্তন প্রয়োজন। জীবনের ভালো দিকটা না ভেবে আগে তার খারাপ দিকটা ভাবব কেন? কেন অন্যের উপর বেশী নির্ভর থাকবো? এইসব নেতিবাচক ভাবনার পর্দা সরিয়ে ফেলে আমরা যদি সঠিক আত্মনির্ভর পথে নিজেদের চালনা করতে পারি, নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি, তাহলেই আমাদের জীবন সুন্দর হবে। তাই স্বচ্ছ জীবন পেতে হলে প্রথমে আমাদের ভাবনাগুলিকে স্বচ্ছ করার প্রয়োজন আছে।

চিঠি থেকে ফেসবুক

রিয়া কর্মকার

বোটানি (অনার্স), প্রথম সেমেস্টার

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রযুক্তির অগ্রগতিকে হাতিয়ার করে মানুষে-মানুষে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে ফেসবুক। একসময় মানুষ চিঠির মাধ্যমে প্রিয়জনদের সঙ্গে মনের কথা আদানপ্রদান করতো। চিঠি পাঠানো, চিঠির উত্তরের জন্য প্রতীক্ষায় থাকার সেই দিনগুলির মধুর 'নষ্টালজিয় ফিলিং' আজও আমাদের স্মৃতি ভারাতুর করে রাখে। তবে জীবন গতিশীল, পরিবর্তনই জীবনের ধর্ম। তাই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিঠি থেকে ফেসবুকে পৌঁছেছি আমরা। ই-মেল, হোয়াটস অ্যাপ ও আমাদের কাছে যোগাযোগের দ্রুত ও প্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। জীবন এখন আরও দ্রুতগামী। এখন আর চিঠির জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় না। ফেসবুকে মেসেঞ্জারে খুব সহজেই প্রিয়জনের সঙ্গে মনের কথা আদানপ্রদান করতে পারি। মিনিটের মধ্যেই উত্তর আসে হাতের মুঠোয়।

ক্রমাগত আমরা ফেসবুকের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ছি। ফেসবুকের মেসেঞ্জারই এখন আমাদের চিঠির ডাকঘর। তাছাড়া শুধুতো খবরের আদান প্রদান নয়। ফেসবুক এমন এক মাধ্যম, যেখানে খেলা থেকে রাজনীতি, শিক্ষা থেকে ধর্ম, সমাজ থেকে স্বাস্থ্য, সকল বিষয়ই আলোচিত হতে পারে। তাই ফেসবুকের বৈচিত্র্যও অপরিসীম। কালের পরিবর্তনে চিঠির প্রয়োজন ও গুরুত্ব তাই ফুরিয়ে আসছে।

যুগ

ইন্দ্রানী রায়
বি.এ. জেনারেল, তৃতীয় সেমেস্টার

যুগ পরিবর্তিত হয়, সিঁড়ির ধাপের মত যুগ থেকে যুগান্তরে যাই আমরা, পৌঁছই অতীত থেকে ভবিষ্যতে। আগেকার দিনে ইলেকট্রিসিটি, পাকা রাস্তা, ঘরবাড়ি, প্রযুক্তি ছিল না। ছিল গরুর গাড়ি, মাটির বাড়ি, কাঁচা রাস্তা, পুকুর, ছিল সুন্দরী প্রকৃতি, বাতাস ছিল দূষণমুক্ত। এই ২০২১-এ পৌঁছে উন্নত প্রযুক্তি আমাদের সহায়ক। অনেক অসম্ভবই এখন সম্ভব হয়েছে। বাড়ি বসেই কাজ করছি প্রযুক্তির সাহায্যে। মোবাইল ফোন হাতের মুঠোয়, কম্পিউটার সব সময়ের সঙ্গী। একদিন পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে খবর আদান প্রদান চলত। এখন মুঠো ফোনেই মুহূর্তে সে কাজ হয়ে যায়।

তবে আগেকার দিনের শৈশব-কৈশোরের সেই গাছে ওঠা, মাঠে খেলা, পুকুরে সাঁতার সে সব যুগবদলের সঙ্গে অতীত হয়ে গেছে। অতি প্রযুক্তি নির্ভরতা মানুষকে যেমন সুখ দিয়েছে, তেমনি অতীতের এই সমস্ত সরল সুখের জগৎ থেকে দূরেও সরিয়ে দিয়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস ভরসা হারিয়ে আমরা যেন এ যুগে শুধুই যন্ত্র নির্ভর। কিন্তু মানুষ হিসাবে পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে হারিয়ে যাওয়া দিনের ঐ সহজ সরল জীবনের স্মৃতিগুলিকেও আমাদের মর্যাদা দিতে হবে। প্রকৃতির সাহচর্যে অতীত দিনের আনন্দের কাছেও ফিরতে হবে আমাদের।

নৃশংস

ঐশী বিশ্বাস

বাংলা (অনার্স), পঞ্চম সেমেস্টার

গ্রামের নাম মালাপ্পুরম। গ্রামটি কেরালা রাজ্যে অবস্থিত। গ্রামের চারপাশে আছে নদীনালা, গাছপালা আর একটা ছোট্ট বন। এই বনের ভেতরেই ছিল এক ছয়মাসের অন্তঃসত্ত্বা হস্তিনীর বাস। সারাদিন সে ঘুরে বেড়াত আর ভাবত তার বাচ্চার সঙ্গে কবে সে খেলা করবে। এইভাবে বাচ্চার কথা ভাবতে ভাবতে তার সারাটা দিন কেটে যেত।

একদিন বনের মধ্যে খাবার না পেয়ে খাবারের সন্ধানে হস্তিনীটা ঢুকে পড়ল গ্রামের ভেতর। লোকালয়ে হাতি ঢুকেছে বলে গ্রামের মানুষ ভয় পেতে শুরু করল, যদি হাতিটা তাদের কোনো ক্ষতি করে দেয়! কিন্তু হাতিটা তো তেমন ছিল না, তার স্বভাব ছিল খুব ভালো। একদিন কয়েকজন দুষ্টু লোক একটা তাজা আনারসের মধ্যে বোমা ঢুকিয়ে গাছের নীচে সেটাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। হাতিটা তো এমন একখানা ফল মুখের কাছে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। তার পেটের ভেতর থেকে বাচ্চা হাতিটা বলে উঠল, "মা, মানুষগুলো কী ভালো না? কী সুন্দর টাটকা ফল রেখে গেছে! তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও মা। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে?

হাতি তখন বলল, "তোকে নিয়ে আর পারি না।"

কথাটা শোনামাত্র বাচ্চা হাতিটা পেটের মধ্যে থেকে বলে উঠল, "আর কটা দিন। তাপ্পর আমি তোমার সঙ্গে খাব, খেলা করব, তখন কী মজাই না হবে!"

একথা বলার কিছুক্ষণ পরেই মা হাতিটা যেই আনারসটা খেয়েছে অমনি আচমকা সেটা পেটের মধ্যে ফেটে গেল। পেটের ভেতর থেকে বাচ্চা হাতিটা চিৎকার করে বলতে লাগল, "মা...মা খুব কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ গরম লাগছে। আমি পুড়ে যাচ্ছি!"

অসহায় মা হাতিটা তখন পেটের সন্তানটাকে বাঁচানোর জন্যে ছটফট করতে করতে কাছের একটা নদীতে ডুব দিল। সন্তানকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা। কিন্তু পারল না। বোমাটা যে পেটের ভেতরটা পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুজনেই মারা গেল।

কেন ওরা মারা গেল? ওদের তো কোনো দোষ ছিল না। হাতিটা তো মানুষকে বিশ্বাস করেই আনারসটা খেয়েছিল। অথচ মানুষ কেমন নৃশংসভাবে একটা হাতি ও তার নিষ্পাপ সন্তানটাকে পৃথিবীর আলো দেখার আগেই শেষ করে দিল! কী অপরাধ ছিল ওদের? এটা কি মনুষ্যত্বের পরিচয়? আমি জানি, ভগবান একদিন ওই মা ও বাচ্চা হাতিটার প্রার্থনা ঠিকই শুনবে। ভগবান একদিন ওই বদমাইশ লোকগুলোকে ঠিকই শাস্তি দেবে। যদি না দেয় তাহলে মা ও বাচ্চা হাতিটার আত্মা যে মরেও শান্তি পাবে না!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্বদিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি' নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে, শুভক্ষণে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর